Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 284 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 284 - 293
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘অমাবস্যার গান’ : কবি ভারতচন্দ্রের মর্মকথা

বাবলী বর্মন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার
Email ID : bablibeng@gmail.com

Received Date 16. 06. 2024
Selection Date 20. 07. 2024

Keyword
Narayan Gangopadhyay, biographical novel, Raigunakar Bharatchandra, eighteenth century, Raj Sabha, King Krishnachandra, Mughal Empire, Feudalism.

Abstract
Medieval poet Bharatchandra Roy in the history of Bengali literature. He is a poet of the juncture of medieval and modern era. The background of his poetry is in the seventeenth century when the Mughal rule firmly established its supremacy in Bengal. And the strong form of feudalism in the social life of Bengal made the life of common people miserable. Bharatchandra's poetic pursuits during that turbulent period. Bharatchandra's self-sacrifice to become a 'Rayagunakar' by overcoming the anarchy of the society-state-family where the society-state-family tries to block the poet's voice has been given an art form by the contemporary writer Narayan Gangopadhyay in his novel 'Amavasyaar Gan'. Narayan Gangopadhyay wrote the biographical novel based on the life of eighteenth century poet Bharatchandra. Narayan Gangopadhyay has selected the period of literary pursuits of Bharatchandra's life and brought the self-torment and self-deprecation of a black artist before the reader. In the Middle Ages there was a tendency to compose poetry at the behest of kings and gods. During that period, the author has drawn the artist's heart or soul in the novel Dardi Shilpi Tuli. Keeping the image of the artist unchanged, Narayan Gangopadhyay has revealed Bharatchandra's life with his own imagination. In this case the novelist is first the reader then the writer. After reading Bharatchandra, the aspect of his life which touched the novelist as a reader, he presented to the reader in the novel. In the novel, the writer talks about Bharatchandra's abysmal dedication to artistry, the distorted form of art and the degenerate form of art when it is placed under the rule of money or infatuation. He has highlighted the essence of art of all times. Bharatchandra's arti is the arti of poets-literature-artists of all times. Narayan Gangopadhyay has portrayed him as an artist and the pain of an artist in the novel.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 284 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অমাবস্যার গান' উপন্যাসটি ১৯৬৫ সালের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় আনন্দ পাবলিশার্স থেকে। অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্রের জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস এটি। বর্তমান সময়ে কবি সাহিত্যিকদের ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্য জীবনকে নিয়ে জীবনী উপন্যাস রচনার প্রবণতা লক্ষনীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে জীবনানন্দ দাশ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামপ্রসাদ সেন – সকলকে নিয়ে জীবনী উপন্যাস লেখা হয়েছে। জীবনী উপন্যাসগুলি গুনমাণেও অনেক উন্নত। শিল্পীর ভাবমূর্তি অপরিবর্তনীয় রেখে, নিজস্ব কল্পনার আশ্রয়ে একজন সাহিত্যিকের কলমে আরেকজন শিল্পী যখন প্রাণলাভ করে তখন তা হয়ে ওঠে সাহিত্যে এক নতুন সংযোজন। পাঠকরা সাহিত্যিকদের সাহিত্যজীবনের পাশাপাশি তাঁদের ব্যক্তি জীবনকেও জানতে বিশেষভাবে উৎসুক। অন্যদিকে ব্যক্তি জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সম্ভব নয়। একজন শিল্পীরও দায়বদ্ধতা থেকে যায় অন্য আর এক শিল্পীকে জানা ও তাঁর জীবনীকে পুনরুদ্ধার করা। একারণেই ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর পূর্বসূরিকে খুঁজতে সেই কবে অষ্টাদশ শতকেই বেড়িয়ে পড়েছিলেন নদীপথে। রায়গুনাকর ভারতচন্দ্রের জীবনী উদ্ধার করে তা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। জীবনী উপন্যাস রচনায় ঔপন্যাসিকরা কল্পনার অবাধ স্বাধীনতার আশ্রয় নেন। ইতিহাস এবং সঙ্গে পাঠকের মনে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা শিল্পীর যে ভাবমূর্তি রয়েছে তাকে রক্ষা করে লেখকেরা পূর্ণ কল্পনার আলোয় শিল্পীর জীবন উদ্ভাসিত করেন। শিল্পীর পূর্ণ অথবা জীবনের একটি খণ্ডকে বেছে নিয়ে নির্বাচিত শিল্পীর জীবনের কোন দিকটিকে পাঠকের পাঠের আলোয় আনতে চাইছেন, তা উপন্যাসে নির্মাণ করেন ঔপন্যাসিকরা। প্রত্যেক শিল্পীরই জীবনকথা আলাদা আলাদা ভাবে এক এক পাঠককে অনুপ্রাণিত করে। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক প্রথমে একজন পাঠক, তারপর তিনি লেখক। কোনো লেখনী পাঠ করার পর শিল্পীর জীবনের কোন দিকটি তাঁকে আনুপ্রাণিত করেছে তারই উপস্থাপন করেন স্বরচিত জীবনী উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একাধিক জীবনী উপন্যাস, জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে একাধিক জীবনী উপন্যাস রচিত হয়েছে। এক একটি উপন্যাস এক একটি আলাদা গবেষণা ও অধ্যাবসায়ের ফল। প্রত্যেক লেখকই নিজ নিজ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁরা পাঠকের সম্মুখে শিল্পীর জীবনের মর্মস্পর্শী যে দিকটিকে উপস্থাপন করতে ইচ্ছুক তা করেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'অমাবস্যার গান' উপন্যাসটিতেও কল্পনার পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্রয় নিয়েছেন। ইতিহাসের পুরোপুরি সত্যতাকে দায়বদ্ধ স্বরূপ বহন করেননি। অন্যদিকে আবার কবি ভারতচন্দ্রের জীবন তথ্যকেও সঠিকভাবে অনুসরণ করেছেন। ভারতচন্দ্রের জীবনসত্যের কোনরূপ হেরফের না ঘটিয়ে আবার শুষ্ক তথ্য ভিত্তিক জীবনী গ্রন্থ রচনা করেননি। আখ্যানে নতুন অনেক টুইস্ট যোগ করেছেন। যা পাঠ করলে পাঠক ভারতচন্দ্রের জীবনের অনেক নতুন দিক সম্পর্কে অবগত হবেন। অনেক কল্পিত চরিত্রের আগমন ঘটেছে উপন্যাসে। যাঁদের হয়ত ইতিহাসের পাতায় কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্তু তাঁরা উপন্যাসের পাতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এমন অনেক সংযোজন এবং কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে লেখক উপন্যাসটি লিখেছেন। অষ্টাদশ শতকের ভারতচন্দ্রকে একজন দেশকাল, সমাজ, রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্তীর্ণ কালজয়ী শিল্পীরূপে এবং তাঁর মর্মকথাকে জীবন্তভাবে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন।

রায়গুনাকর ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০) মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি। বাংলাসাহিত্যে মধ্যযুগের প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের ধারায় তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য লিখিত। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে দেবী অন্নপূর্ণার আজ্ঞায় লেখা এই কাব্য মধ্যযুগের শেষ মঙ্গলকাব্য। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের পটভূমি, সপ্তদশ শতাব্দীর মোঘল শাসকের অত্যাচারের ফলে বিধ্বস্ত বাংলার মানুষজনের হাতে 'ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ' অবস্থার সময়কাল। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' নিয়ে যুগে যুগে বিচার-বিতর্ক অব্যাহত রয়ে গিয়েছে। কবিরও কপালে জুটেছে কাব্যের গুনাগুণ নিয়ে অনেক ভালো মন্দ প্রতিক্রিয়া। যা কবিকে সময়ের প্রেক্ষিতে আরো শক্তিশালী করেছে, সাহিত্য রচনায় নিজের শিল্পীসত্তায় অটুট বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে। তাঁর সৃষ্টির রুচিবোধ নিয়েও সমালোচনার শেষ নেই। যুগের রুচি অনুযায়ী তিনি রাজার আদেশে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছেন। এরপর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তিনি আরো একটি কাব্য রচনা করেন 'বিদ্যাসুন্দর' নামে। সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ভারতচন্দ্রের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক অস্থিরতা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের ফলে বিদেশি বণিক এবং দেশীয় নানা

শক্তির যে ক্ষমতালাভের প্রস্তুতি চলছিল তা যেন সফল হয়। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর দেশের অরাজকতার সীমা অতিক্রান্ত হয়। সারা দেশময় লুণ্ঠন, দখলদারি ক্ষমতা এক কথায় যে যেদিক থেকে পারে দেশকে শোষণ করতে শুরু করে। দেশে নৈতিকতার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। আর ভারতচন্দ্রের ৪৮ বছরের জীবন এই কালপর্বেই। তাঁর জীবন সম্পর্কে সমালোচক ও প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন –

> "যিনি রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করে এগারো বৎসর বয়সে পরভাগ্যোপজীবী হতে বাধ্য হন, যিনি এগারো থেকে বিশ বৎসর পর্যন্ত পরের আশ্রয়ে পরান্নভোজনে জীবনধারণ করে বিদ্যা অর্জন করেন, তারপর আত্মীয়স্বজনের জন্য ওকালতি করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন, তারপর জেল থেকে পালিয়ে স্বদেশ ত্যাগ করে কটকে গিয়ে মারহাট্টাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, তারপর শ্রীক্ষেত্রে বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চা করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তারপর আবার গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবার জন্য প্রথমে দুপ্লে সাহেবের দেওয়ানের, পরে কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট আশ্রয় পান, আর তথায় চল্লিশ টাকা মাইনের চাকর হয়ে কাব্যরচনা করেন, এবং শেষকালে গঙ্গাতীরে বাস করতে গিয়ে আবার বর্ধমান-রাজার রাজকর্মচারীগণ কতৃক নানারকম উৎপীড়িত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি যে কতটা বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছিলেন তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন।"[১]

এরকম একজন মানুষের জীবনে যেখানে পায়ের নিচের মাটি কিংবা পরের দিন কি খেয়ে থাকবেন, কোথায় রাত কাটাবেন তাঁর নিশ্চয়তা পর্যন্ত নেই। তিনি সাহিত্য চর্চার জন্য সবকিছু করেছেন। আজীবন নিজের মেধা ও শিক্ষাকে সঙ্গী করে প্রতিনিয়ত ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেছেন। দারিদ্র্য যেমন তাঁর পিছু ছাড়েনি তিনিও স্রোতের বিপরীতে দারিদ্র্যকে জয় করেছেন, দারিদ্র্যতাই যেন কবিকে আরো মহান করে তুলেছে। শিক্ষার মূল্য যে অন্ন, বস্ত্র, খাদ্যের থেকে বহুমূল্যবান তা তিনি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। আজীবন সরস্বতীর বরপুত্র হয়ে সাহিত্যসাধনা করেছেন। মধ্যযুগে কবিকে দাঁড় করানো হত জনতা এবং রাজার দরবারের কাঠগোড়ায়। সেখানে কবিকে তাঁর নিজের শিল্পীসত্তাকে বিসর্জন করে রাজার ও জনগনের রুচিবোধের আদালতে তাঁকে রায় দেওয়া হত কবি কতটা সফল। সকলেই তো সমঝদার পাঠক ছিলেন না। দেশজুড়ে তখন আদি রসের বা শৃঙ্গার রসের প্রাবাল্য। সকলেই যেন সমাজ, রাষ্ট্রের অরাজকতাকে আদিরসের মদিরা আস্বাদনের মধ্য দিয়ে সবকিছুকে ভুলতে ইচ্ছুক। তৎকালীন সময় এবং সমাজ কবির মেধা, বোধ-বুদ্ধি, বিচক্ষণতার উপরে হস্তক্ষেপ করত ক্ষমতার প্রবল রূপকে হাতিয়ার করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসটিতে ভারতচন্দ্রের সম্পূর্ণ জীবনকে তুলে ধরেননি, নির্দিষ্ট একটি সময়পর্বকে বেছে নিয়েছেন। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত ভারতচন্দ্র শ্রীখণ্ড থেকে বৃন্দাবনের পথে যাত্রাকালে খানাকুল-কৃষ্ণনগরে অবস্থানের সময়পর্ব থেকে উপন্যাসের সূচনা। এখানেই তাঁর শ্যালিকা-পতি খবর পেয়ে জোর করে তুলে নিয়ে আসে বৈষ্ণবদের মাঝ থেকে এবং তাঁকে পুনরায় গৃহজীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। ফলে তাঁকে অর্থের তাগিদে কর্মের জন্য কলকাতার ফরাসডাঙ্গার দ্যুপ্লে সাহেবের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছারিতে চাকরি জীবন কাটাতে হয়। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সূত্রেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং রাজবাড়িতে সভাকবি, মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে। এখানেই রাজসভায় কবির কাব্যপ্রতিভার কদর এবং স্ফুরণ। রাজার আদেশে 'অন্নদামঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর' লেখা। রাজা কর্তৃক কবিকে রায়গুনাকর উপাধিদান। মূলাজোড়ে রাজার প্রদত্ত জমিতে কিছুদিন পরিবার সহ ভারতচন্দ্রের বাস এবং ইংরেজ-ফরাসিদের ঔপনিবেশিক শক্তির বাংলায় কর্তৃত্ব কায়েমের সংবাদের মাধ্যমে উপন্যাসের সমাপ্তি। এই সময়পর্বের মধ্যে ভারতচন্দ্রের জীবনের সাহিত্য সাধনার ভিত নির্মাণের মূল অংশ। ভারতচন্দ্র সাহিত্য রচনার জন্য পরিবার ও সমাজ, দেশকাল, রাষ্ট্রের অন্ধকারের মধ্যেও যে আগামী নতুন দিনের সূর্যের আলো স্বরূপ ভোরের প্রভাতী সঙ্গীত আপন কণ্ঠে গেয়েছিলেন তাকে একালের বিংশ শতকের তারই উত্তরাধিকার শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস নামক শিল্পমাধ্যমে রূপদান করেছেন। চাঁদের অমাবস্যা স্বরূপ দেশ-কাল-রাষ্ট্রের অমাবস্যার মাঝেও শিল্পী সাহিত্যিকদের গান যে আপন আপন বীণায় সুর তোলে এবং সকলের কর্ণ-মস্তিষ্ক থেকে হৃদয়ে স্থান করে নেয়। তা আলোচ্য 'অমাবস্যার গান' উপন্যাসটিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পাঠকের সামনে এনেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 284 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তিনি ভারতচন্দ্রকে একজন দেশ-কাল-রাষ্ট্রের উর্দ্ধে মরমী কবির শিল্পী জীবনের আত্মকথাকে ভাষারূপ দিয়েছেন। ভারতচন্দ্র যে আজীবন নিজের কলমে অন্যের চাওয়া পাওয়ার কথা বলে গিয়েছেন। নিজের শিল্পসত্তার কথা, কবির মর্মকথাকে বলতে চাইলেও তাকে পোশাক অলংকারের কারুকার্য দিয়ে সজ্জিত করে বলতে হয়েছে। তার মধ্যে যে প্রেমিক সত্তা ছিল তার কথা উপন্যাসে পাই। কালিদাসের মত কবি ভারতচন্দ্রেরও মালিনী চন্দ্রাবলীর প্রসঙ্গ, ফিরিঙ্গি সৈনিক ও বাঙালি মেয়ের প্রেমের কথা, ইন্দ্রনারায়ণ এর মত উদার স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব, কৃষ্ণচন্দ্রের মত রাজার কথা আছে উপন্যাসটিতে যারা ভারতচন্দ্রের কবিসত্ত্বার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। সমাজ-রাষ্ট্রের অন্ধকারের মধ্যেও যে মানুষের সুরুচি, সুবৃত্তি, সুপরামর্শ মলিন হয়ে যায় না। কিছু কিছু শিল্পী অন্ধকারেরও অন্নের অনিশ্চয়তা সত্বেও অন্তরের আলো জ্বালিয়ে রাখে, তা উপন্যাসটি পাঠ করলে স্পষ্ট হয়। উপন্যাসটির সূচনা হয় এভাবে –

> “পুরী থেকে বৈষ্ণবের দল চলেছে বৃন্দাবনের পথে। মহাপ্রভুর নির্বাণ তীর্থ থেকে রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি ব্রজধামে। সাক্ষীগোপালকে প্রণাম করে, বর্গীর অধিকারের সীমা পার হয়ে, কুলীন গ্রামের পরম ভক্ত মালাধর বসুর অঙ্গনে সংকীর্তন করে, খানাকুল-কৃষ্ণনগরে।”[২]

এই খানাকুল-কৃষ্ণনগরেই ভারতচন্দ্রের শ্যালিকা-ভাই মুকুন্দ ভট্টাচার্যের বাড়ি। ভৃত্য রঘুনাথ কর্তৃক ভারতচন্দ্র মুকুন্দ ভট্টাচার্যের গৃহে বন্দি হন। মুকুন্দ চক্রবর্তী নিজগৃহে ভারতচন্দ্রকে আটকে রেখে পত্নী লীলাবতীকে ভারতচন্দ্রের কাছে নিয়ে আসেন। এখানে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে লীলাবতীর কথপোকথন হয়। এরপর মুকুন্দ ভট্টাচার্য ও তাঁর সহধর্মিনী সৌদামিনীর সুপরামর্শে পুনরায় সংসার ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে ভারতচন্দ্র কর্মের চেষ্টায় অন্নের সহাবস্থানের জন্য কলকাতার ফরাসডাঙায় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হন। চন্দননগর বা তৎকালীন ফরাসডাঙার বর্ণনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চন্দননগরের শাসনকর্তা জোসেফ ফ্রাঁসোয়া দ্যুপ্লে সাহেব, তাঁর দেওয়ান এদেশীয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। চন্দননগর বা ফরাসডাঙার বর্ণনা ঔপন্যাসিক কিছুটা কল্পনা এবং সময়োপযোগী ফরাসীদের রূপবর্ণনা দেশকালের প্রেক্ষিতে করেছেন –

> “আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কেল্লার বুরুজ। গঙ্গার ধারে শাহী সড়কের পাশে রং-বেরঙের প্রাসাদের সার। মাঝগঙ্গায় দু-তিনটি অতিকায় জাহাজ’ অসংখ্য নৌকার ভিড় - সারি সারি কাপড়ের গাঁট নিয়ে নৌকাগুলো জাহাজে তুলছে। শয়ে শয়ে লোক- দোকানপসার, মাঝখান দিয়ে মাটি কাঁপিয়ে চলেছে বিদেশির দল - আকাশের চাঁদের মত গায়ের রং, মাথার চুল যাদের আগুনবর্ণ, কোমরে যাদের তলোয়ার ঝনঝন বাজে।”[৩]

লেখক উপন্যাসে যে কল্পনাশক্তির ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন তা বিশেষত নায়েব ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দান-ধ্যান-অতিথিসেবা পরায়ণ রূপ এবং পুরনো চন্দননগরের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ অঙ্কনে। তৎকালীন ফরাসি বণিকদের পক্ষে যে সবই সম্ভব তা লক্ষণীয়। ফরাসিদের শহর নির্মাণের যে সৌন্দর্য বোধ তা শহরের বর্ণনায় স্পষ্ট –

> “গঙ্গার ধারে অপরূপ সুন্দর, ঐশ্বর্যে ঝলমল এই শহরের পথ ধরে ভারতচন্দ্র ভয়-ব্যাকুল পায়ে এগিয়ে চলেছেন। কোথাও সাজানো সব দোকান, ফরাসীরা সেখান থেকে কিনছে হাতির দাঁতের জিনিস, বেতের লাঠি, শোনারূপোর কারুকাজ; ঘরে ঘরে তাঁত চলছে - রূপ পাচ্ছে সূক্ষ্ম মসলিন, মাকুর টানে রং-বেরঙের সূক্ষ্ম সুতো যেন ইন্দ্রধনুর জাল বুনছে; কোথাও স্তূপাকার পাটের উগ্র গন্ধ- তৈরি হচ্ছে জাহাজ বাঁধবার বড়ো বড়ো কাছি; আর কোথাও ছুতোরের যন্ত্রে উঠছে ঠুকঠুক আওয়াজ, পালিশ করা মেহগনির ওপর আশ্চর্য সব নকশা তুলছে শিল্পী। শহর নয় - যেন ইন্দ্রলোক। আর সেই ইন্দ্রলোকের ইন্দ্র ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্বয়ং। সার্থক নাম।”[৪]

গঙ্গার ধরে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্থাপন করেছেন নন্দদুলালের মন্দির, চন্দননগরের দুর্গাপূজার প্রচলন করেন তিনি। জাতপাতের সংকীর্ণতায় দ্বন্দ্বেদীর্ণ সমাজ তাঁর কাছ থেকে হাত পেতে অর্থ দান গ্রহণ করলেও অন্ন কেউ তাঁর গৃহে গ্রহণ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 284 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করত না। কারণ তিনি এক বিদ্যাধরীকে সকলের সামনে পরিচয় দিয়ে মন্দিরে সেবার জন্য নিযুক্ত করেন। বিদ্যাধরীকে সকলেই মা বলে ডাকেন। লেখক সেই কুলীন ব্রাহ্মনদের প্রতি ভারতচন্দ্রের বিরূপ মানসিকতা প্রকাশ করেছেন কিন্তু তৎকালীন সমাজে সকলের সমক্ষে নয় মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমে –

> "গোপনে পাপ করলে অপরাধ হয় না, আর সাহস করে মেয়েটিকে সামনে এনেছেন- তাকে সম্মান দিয়েছেন বলেই যত দোষ হল চৌধুরী সাহেবের? এই ভণ্ডামির নাম ধর্ম?"[৫]

আবার প্রকাশ্যে মুখে প্রতিবাদের ভাষা দিয়েছেন –

> "তা চৌধুরী মশাই তো পতিত। ওঁর অন্ন খেলে জাত যায়, টাকা নিলে বুঝি জাতের ক্ষতি হয় না কিছু?"[৬]

কিংবা "ভাববেন না, আমার জাত সহজে যাবে না। তার বনেদ অনেক শক্ত।"[৭] এরকম অনেক উক্তি তিনি ভারতচন্দ্রের মুখে দিয়েছেন, যা অষ্টাদশ শতকের সমাজের বিরুদ্ধে সমক্ষে প্রতিবাদ তথা জাতপাতের উর্দ্ধে মানুষকে মানুষ বলে সম্মান জানানোর মত সাহস সেযুগে দাঁড়িয়ে ভারতচন্দ্রের ছিল। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে এঁকেছেন সামাজিক রক্তে মাংসের মানুষরূপে। যার প্রচুর অর্থ প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও বলতে হয় –

> "বাপু হে, শ্রীক্ষেত্রে সব চলে। সেখানে চণ্ডাল এসে ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন তুলে দেয়, লোকে বলে, 'প্রসাদী খাইয়া ভাত, মাথায় মুছিবে হাত' - তীর্থমাহাত্ম্যে সব খণ্ডন হয়ে যায়। কিন্তু দেশ-গাঁয়ে তো আর ও-সব চলে না, সেখানে দেশাচার-লোকাচার মানতেই হয়।"[৮]

ইন্দ্রনারায়ণের বিধ্যাধরীকে মন্দিরের রাধামাধবের বিগ্রহের সেবার জন্য নিয়োগ করার কথা আমরা আলোচ্য উপন্যাসেই প্রথম জানতে পারি। তিনি যে সকলের সমক্ষে বিদ্যাধরীর পরিচয় দিয়েছেন তা সেকালে দাঁড়িয়ে কতটা সাহসী মানসিকতা তা ইন্দ্রনারায়ণের ব্যবহারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বিদ্যাধরীর পূর্ব জীবনের করুণ কাহিনি পাঠকের সামনে এনেছেন। যা তৎকালীন অষ্টাদশ শতকের সামাজিক মানুষের মনে নারীদের সম্পর্কে যে শুচিবায়ুতা ছিল তার দৃষ্টান্ত। বিদ্যাধরীর স্বামী শ্বশুরের ব্যবহারে সমাজের ডাকাতের দ্বারা অপহৃতা নারীদের প্রতি বিরূপ মানসিকতার স্বাক্ষর বহন করে। সেকালে কোনো নারী বর্গী, ঠ্যাঙারে কিংবা ঠগীর দ্বারা অপহৃতা হয়ে গৃহে ফিরে এলে তাকে গ্রহণ করতে নারাজ সমাজ। তখন মেয়েটির আত্মহত্যা ছাড়া অন্য পথ থাকে না। বিদ্যাধরীও পথে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপেরবাড়ি যাত্রাকালে ডাকাত কর্তৃক অপহৃতা হয়ে গয়নাকাঠি সব হারিয়ে অচেতন অবস্থায় পড়েছিল মাঠের ভিতরে। পথে মেয়েটিকে পড়ে থাকতে দেখে ইন্দ্রনারায়ণ মেয়েটিকে তুলে তার শ্বশুর গৃহে নিয়ে গেলে তাকে আর শ্বশুর বাড়িতে মেনে নেওয়া হয় না। এরপর ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাকে নিজগৃহে এনে সকলের সামনে পরিবারের পরিচয় দিয়ে রাধামাধবের মন্দিরে সেবার কাজে নিয়োজিত করেন। ফরাসডাঙায় অবস্থানকালে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে বিধ্যাধরীর কথপোকথন হয়। ভারতচন্দ্র বিদ্যাধরীর শান্ত সৌম্যরূপকে দেখেছেন যা সমাজ রটনার থেকে শতহস্ত দূরে -

> "যেন ভাদ্রের ভরা গঙ্গা, গভীর, শান্ত, নিজের ভিতর নিমগ্ন... রূপ নয় রূপের চাইতেও অনেক বেশি আছে তার, সে তার অন্তরের লাবণ্য। মুখে-চোখে জ্বলজ্বল করছে ভক্তি, বিশ্বাস। এই মেয়েটিকে গ্রহণ না করে ইন্দ্রনারায়ণ যদি পাঁচটি যবনী আর আরমানী বাইজী রাখতেন, তা হলে কেউ এতটুকুও নিন্দা করত না; সবাই একবাক্যে বলতঃ 'বেশ করেছেন, এ না হলে আর কিসের বড়লোক'!"[৯]

কবিসত্তার বহিঃপ্রকাশে ভারতচন্দ্রের মধ্যে লেখক অন্তরের ধর্মের প্রতি অনেক প্রাধান্য দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার মত বিদ্যাধরীও তার শ্রেষ্ঠ দান স্বরূপ লাজ-লজ্জা, বসন-ভূষণ, জীবন-যৌবন যথাসর্বস্ব দিয়েছেন নন্দদুলালকে উদ্দেশ্য করে যেন ইন্দ্রনারায়ণকেই। যার ভালো মন্দ সকল কাজের অংশীদার দুজনই। সেকালের সমাজ পরিবেশে অবস্থান করেও ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী যে তার সকল কর্মের মধ্যে আধুনিক মনস্কতার পরিচায়ক ছিলেন তার কথা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন। ভারতচন্দ্রও সেই আধুনিক মনভাবাপন্ন মানুষটির সংস্পর্শে এসে দেশ-কালের পঙ্কিলতার মধ্যেও এক চিলতে

আলোর ঠিকানা পান। যিনি তাকে তার পরবর্তী ভবিষ্যৎ পথের দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। কাব্য কবিতা সঙ্গীতের অনুরাগী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয় করিয়ে দেন। অন্য কাজ দিলে ভারতচন্দ্রের কবিত্ব নষ্ট হয়ে যাবে, কবির মূল্য যে কতটা তা ইন্দ্রনারায়ণের মত মানুষের পক্ষেই অনুভব সম্ভব। তাই ভারতচন্দ্র ইন্দ্রনারায়ণের গৃহে অবস্থানকালে ভারতচন্দ্রের কণ্ঠে স্বরচিত গান গাইতে শুনে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী উপদেশ দেন কাব্য-কবিতার, সঙ্গীত-শিল্পের সমঝদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার। ভারতচন্দ্র এসময় অনুভব করেন কবিকে কেউ চায় না। লোকের জন্য বাইজি আছে, খেউর আছে তার চেয়ে বরং তিনি ইন্দ্রনারায়ণের কাছেই থাকবেন। এই পর্বে কবির মনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তার প্রকাশ লক্ষনীয়।

এরপর অন্যমনস্ক কবির চিন্তায় ছেদ পরে যখন তিনি দেখেন যে কল্পনা করতে করতে কখন ফরাসডাঙার কেল্লার ধারে লালদীঘির পিছনে ক্রিশ্চানদের সমাধির স্থানে এসেছেন। এই সমাধি স্থানে পুকুর পাড়ে ঔপন্যাসিক কল্পিত এক ফিরিঙ্গীর প্রেম কাহিনি ভারতচন্দ্র শোনেন। যা সেকালে দাঁড়িয়ে আধুনিক চিন্তাচেতনার সাক্ষী হন কবি ভারতচন্দ্র। জাঁ নামের এক ফিরিঙ্গি যুবক কবি ভারতচন্দ্রকে পনেরো বৎসর পূর্বে তাঁর সৈনিক বন্ধু মার্সেলের ভালোবেসে আত্মবলিদানের কাহিনি বলেন। ফরাসি সৈনিক মার্সেল এদেশীয় বাঙালি কন্যা কমলার প্রেমে পড়েন কিন্তু সৈনিকদের কঠোর আইনের ফলে তাঁর প্রাণদণ্ড হয় মৃত্যু। জাঁ ভারতচন্দ্রকে এদের প্রেমকাহিনি নিয়ে কবিতা লিখতে বলেন। কিন্তু কবি তাতে অসম্মতি জানান যে –

> “আমাদের দেশে মানুষের প্রেমের কথা নিয়ে কাব্য লেখার নিয়ম নেই। সব কিছু লিখতে হয় দেবতাকে নিয়ে।”[১০]

মধ্যযুগে যে দেবতার আদেশে দেবমহিমাকে ভাষারূপ দানের প্রবণতা ছিল তা ভারতচন্দ্রকে মর্মাহত করেছে। তিনি নিজের কথাকে কবিতায় বলতে চাইলেও তাঁর হাতে শৃঙ্খল পড়ানো জনগনের রুচি এবং রাষ্ট্রিক ক্ষমতার কাছে, কবিকেও যে দুমুঠো অন্নের জন্য বেঁচে থাকতে হয়। সেই অন্নদাতার কথাকে তাই অমান্য করার ইচ্ছা থাকলেও উপায় হয় না। তাঁর এই প্রভাব তাঁর ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যেও পড়েছে। ঈশ্বরী পাটনী তাই সব ছেড়ে বলেন অন্নের প্রয়োজন তাঁর-

> “প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।/ আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।।/ তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।/ দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।।”[১১]

রাষ্ট্রিক অরাজকতার মাঝে কেবলমাত্র প্রাণরক্ষা করাই যাদের পক্ষে কঠিন সেই পরিবেশে কবিতা লিখে জীবননির্বাহের কথা কারো কল্পনারও বাইরে। তাই ভারতচন্দ্রকেও বলতে হয় –

> “আজকাল কবিতার দাম আর কে দেয় বলুন।”[১২]

অথবা

> “কবিত্ব আছে বলে সেই অপরাধে আমায় কি না খেয়ে মরতে হবে চৌধুরী মশাই?”[১৩]

এবাক্য যেন সকল কালের শিল্পীর মর্মকথা। এরপর ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে কবি ভারতচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেন। রাজা কবিকে মুখে মুখে পদ পূরণ করতে বললে তৎক্ষণাৎ ভারতচন্দ্র কবিতার পদপূরণ করে দেন এবং রাজা খুশি হয়ে ভারতচন্দ্রকে নদীয়ার নবদ্বীপের রাজসভায় আমন্ত্রণ জানান সভাকবি হয়ে থাকার জন্য মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে। রাজসভায় রসিক গোপাল ভাঁড়ের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ের মধ্যে রসিকতার প্রসঙ্গ উপন্যাসে রয়েছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ভারতচন্দ্র ‘অন্নদামঙ্গল’ রচনা করেন। এ সময় তিনি রাজার আদেশে রাতের পর রাত না খেয়ে, না ঘুমিয়ে শ্রম ও কঠোর অধ্যাবসায়ের ফলে কাব্যটি সমাপ্ত করেন। যথাসময়ে কাব্যটি রাজসভায় পাঠ হলে কাব্যটি রাজার পছন্দ হয়না। যে কাব্যটি লিখতে ভারতচন্দ্র নিজের বোধ-বুদ্ধি উজার করে দিলেন, যা শুনে পণ্ডিত, তর্কালঙ্কার, জনগণ বাহবা দিলেন কিন্তু রাজাকে তা তৃপ্তি দিলেন না। তিনি মতামত দেওয়ার জন্য সন্ধ্যাবেলায় ভারতচন্দ্রকে একলা দেখা করতে বললেন। এ সময় ভারতচন্দ্র ভেঙ্গে পড়েন। লেখকের বর্ণনায় এভাবে ব্যক্ত হয়েছে –

> "উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালেন শহরের পথে পথে- বার বার নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল: কী হল? শেষ পর্যন্ত এরই জন্য একটা বছর তিনি কৃষ্ণনগরের চাটুকারী করে কাটালেন? 'তদর্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' কিন্তু রাজসেবার চাইতে ভিক্ষাও ভালো। সেখানে আত্মমর্যাদার কোনো বালাই থাকে না বলে আত্মসম্মান হারাবার কোনো ভয়ও থাকে না। এ-ই রাজা? এ-ই রসিকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র? এঁরই স্তুতিগানে তিনি পাতার পর পাতা ভরিয়েছেন?"[১৪]

এমতাবস্থায় ভারতচন্দ্র সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তিনি কোনো শান্ত পাড়াগাঁয়ে টোল-চতুষ্পাঠী খোলার কথা ভাবেন অথবা যাজন-যজন করবেন। ব্রাহ্মণ সন্তানের তাতে লজ্জা পাওয়ার কথা নয়। এরপর রাজা তাঁকে নিজ বাসভবনে নিয়ে গিয়ে আদিরসের উপযোগী 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করার আদেশ দেন। কবিরও তো শ্রোতা চাই, সেজন্য শ্রোতা এবং অন্নদাতার কথাকে শিরধার্য করে ভারতচন্দ্র কাব্য রচনার কথা ভাবতে শুরু করেন। এই সময়পর্বের কবি ভারতের অন্তরের দ্বান্দ্বিকতা লেখকের কলমে এভাবে ভাষা পেয়েছে –

> "আদিরস। আদিরসের বন্যা বইয়ে দিতে হবে, রাজার মন ভালো করে দিতে হবে, দেশের লোকের ইতর-রুচির উপাসনা করতে হবে! যে শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে অন্নপূর্ণার মহিমা বন্দনা রচনা করতে চেয়েছিলেন, সেই মনকে আজ চালনা করতে হবে গণিকাবৃত্তির দিকে।"[১৫]

আলোচ্য উপন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কবি কালিদাসের মালিনীর মত ভারতচন্দ্রেরও এক মালিনীর প্রসঙ্গ এনেছেন। যার নাম চন্দ্রাবলী। সে রাজ নর্তকি, গণিকাবৃত্তি যার পেশা। এই চন্দ্রাবলী ভারতচন্দ্রকে সকালে পদ্মফুল যোগান দিত। সে ভারতের কাছে তাঁর কাব্য যে রাজার অপছন্দ তা জানাতে আসে, এবং রাজা যে তাঁকে আদিরসের কাব্য লিখতে আদেশ দিয়েছেন সে সংবাদের প্রতিক্রিয়ায় ভারত জবাব দেয় –

> "তোমাদের কথাই তো শুনতে হবে, তোমরাই তো আজ রস-রুচি-কাব্যের ভাগ্যবিধাতা। কালিদাসের পরিণাম ঘটেছিল লক্ষহীরার কুঞ্জে-আমাকেও একদিন তোমার কুঞ্জেই যেতে হবে সব দেনা মিটিয়ে দেবার জন্য। নইলে আমি রাজকবি হতে পারব না!"[১৬]

চন্দ্রাবলী ভারতচন্দ্রের কাছে আদি রসের প্রতি বিরাগের কারণ জানতে চান এবং কবিকে আদিরসই যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রধান উপকরণ তা বলেন। নরলীলাকে আশ্রয় করেই রাধাকৃষ্ণের কথা শোনাতে বলেন। যার বাইরে থাকবে বিলাস, ভেতরে থাকবে বৈরাগ্য, মনে থাকবে রাধাগোবিন্দ বাইরে থাকবে লোকলীলা। যে বোঝবার সে ঠিক বুঝবে। সময় হলে লোকে কবির মূল্য বুঝবে বলে মালিনী চন্দ্রাবলী সেস্থান ত্যাগ করে। উপন্যাসের আখ্যানে দেখি মালিনীর অনুপ্রেরণায় কবি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যটি রচনা করেন। রাজসভায় এই কাব্য পাঠ হলে রাজা কবিকে বাহবায় ভরিয়ে দেন এবং কবিকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দান করেন –

> "অপূর্ব- অদ্ভুত! কৌতুকে, রসিকতায়, কবিত্বে কামশাস্ত্রকে মহাকাব্য করে তুলেছ তুমি। বিহ্লন, অমরু, রাজশেখর- সবাই ম্লান হয়ে গেছে তোমার কাছে। আজ আমি তোমায় উপাধি দিচ্ছি 'রায়গুণাকর'।"[১৭]

এই কাব্যটি মহারাজ ও শ্রোতাগণ সকলেরই পরম উপভোগ্য হয়। রাজা কবিকে উপহার স্বরূপ মূলাযোড়ে পরিবার সহ বাসের উপযোগী ভূমি এবং গৃহ দান করেন। যে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের জন্য এত খ্যাতি সেই কাব্যটি কবিকে যেন প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণা দিয়েছে। তিনি বিজয়ী, কিন্তু সে জয়, প্রতিভার কোন মূল্য নেই। শিল্পের বিকৃতি কবিকে আত্মদগ্ধ করেছে –

> "আজও অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরলেন ভারতচন্দ্র, তারপর এসে দাঁড়ালেন খড়ে নদীর ধারে। ... কী তিথি আজ? মনে পড়ল অমাবস্যা। ... সেই অমাবস্যায় গ্রাম ডুবে আছে, দেশ ডুবে আছে। আরো কোন্ অন্ধকার তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে কেউ জানে না। সেই আগামী শীতের রাতের জন্য ভারতচন্দ্র

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 284 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> লিখে গেলেন তাঁর বিদ্যা-সুন্দর। কবিকঙ্কণের গান হারিয়ে যাবে, অন্নপূর্ণার কথা কেউ শুনতে চাইবে না- কিন্তু বিদ্যা-সুন্দরের গানে সে রাত বিষে আবিল হয়ে উঠবে। সেই বিষপাত্র ভারতচন্দ্রই আজ দেশের মুখে তুলে দিয়ে গেলেন।"[১৮]

উক্ত পংক্তিটি যে কোনো শিল্পীর আত্মগ্লানির মর্মান্তিক বিষাদগাঁথা। কৃষ্ণনগরের রাজ আবহাওয়ায় কেবলমাত্র 'বিদ্যাসুন্দর' কিছুদিনের জন্য কবির জীবৎকালে বাহবা পায়। রসের বন্যায় শ্রোতারা মশগুল হয়ে দেশের হত্যা, যুদ্ধ, রক্ত, চক্রান্ত, বিদেশি বণিকের অত্যাচার, চোর-ডাকাত-বর্গীর হাঙ্গামা, ফিরিঙ্গি-মগ-হার্মাদদলের অত্যাচারে পিষ্ট সবাই সবকিছু ভুলে থাকার চেষ্টা করে। কেবলমাত্র বিদ্যাসুন্দরের পালাই সকলের মনে বেঁচে থাকে। এই অবস্থা ভারতচন্দ্রের শিল্পী সত্তাকে ভীষণভাবে ব্যথিত করে। ভারতচন্দ্রের আত্মদণ্ডের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক তাঁর কবি জীবনের মর্মকথাকে দেখিয়েছেন –

> "কী হবে লিখে? কার জন্য লিখব? আমি তো জানি আমি কী লিখতে পারতুম- কী লিখে গেলুম! আমার খ্যাতি কিসে টিকে থাকবে জানো? ওই বিদ্যা-সুন্দরে। কেউ ওর আসল অর্থ বুঝবে না, কেউ বুঝবে না আমার যন্ত্রণা, শুধু তারিয়ে তারিয়ে পড়বে ওর রসিকতা, মজে থাকবে ওর ভোগবিলাসে, বলবে- শাবাস কবি, শাবাস কবিত্ব! লীলা, কিসের বিনিময়ে আমার এই যশ, এই সৌভাগ্য, এই অর্থ? আমি কী দিতে চেয়েছিলুম, আর কি দিলুম?"[১৯]

এই আত্মগ্লানি এবং আত্মযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কবি ভারতচন্দ্রের শিল্পীসত্ত্বার বহিঃপ্রকাশের যে প্রতিবন্ধকতা তাকে উপন্যাসে তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে শিল্পীর কাছে তাঁর শিল্পের দায়বদ্ধতার মূল্য কতটা। এই দায়বদ্ধতার জন্য ভারতচন্দ্র আজও একবিংশ শতকের পাঠকের কাছে স্বর্ণাক্ষরে জীবিত হয়ে আছেন। সমাজ-রাস্ট্রের পারিপাশ্বিক অন্ধকারের মধ্যেও কবি ভারতচন্দ্র তাঁর আপন কণ্ঠের গানকে ভাষারূপ দিয়েছেন। তা যতই সেকালের রাজ আদেশ কিংবা জনগণের রুচির পরিচয় হোক। একবিংশ শতকের পাঠক কবিকে বুঝতে ও জানতে উৎসুক। তাই একালের সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রের অমাবস্যাপূর্ণ জীবনের কথাকে ভাষারূপ দিয়েছেন এবং সাহিত্য শিল্প যে ক্ষণিকের কথাই বলে না সম্ভাব্য অতীতের কথাকেও বলে তা দেখিয়েছেন। শিল্পের কথা হল শ্বাশ্বত। তা সকল কালের শ্রোতার মনে সময়ের আলোড়নে ঢেউ তোলে, পাঠক মনে সাড়া জাগায়। তাই ভারতচন্দ্র কালের গণ্ডি পেরিয়ে কালোত্তীর্ণ হয়ে আছেন পাঠকের আপনজন হয়ে। বর্তমান শতাব্দীতেও যখন শিল্পী তাঁর নিজের সৃষ্টিকে ক্ষমতার স্তুতিগানে এবং প্রতিষ্ঠার মরীচিকায় শিল্পকে কোণঠাসা করতে চান, তখনই 'অমাবস্যার গান' সমাজ এবং রাষ্ট্রের অমাবস্যার প্রকৃত গান হয়ে ওঠে। যুগোপযোগী আখ্যান নির্মাতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাই ভারতচন্দ্রের আত্মচিন্তার মধ্য দিয়ে সর্বকালের পাঠকের জন্য উপন্যাসটি রচনা করে শিল্পীর মর্মকথাকে বা আঁতের কথাকে বের করে এনেছেন। আধুনিক শিল্পী-সাহিত্যিকদের এই আখ্যান পাঠের প্রয়োজন আছে। শিল্পী হিসাবে আর এক শিল্পীর প্রতি, তাঁর শিল্পসত্তার প্রতি যে দায়বদ্ধতা সে কাজটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় করেছেন 'অমাবস্যার গান' এ উপন্যাস নামক শিল্পমাধ্যমে।

Reference:

১. চৌধুরী, প্রমথ, প্রবন্ধ সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ৭ আগস্ট, ১৯৫২, পৃ. ২৪৭

২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, অমাবস্যার গান, জয়শ্রী প্রকাশনী, ৩/১ বিদ্যাসাগর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, জয়শ্রী সংস্করণ, আগস্ট, ২০২৩, পৃ. ১৫

৩. তদেব, পৃ. ৪০

৪. তদেব, পৃ. ৪২

৫. তদেব, পৃ. ৪৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 284 - 293
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. তদেব, পৃ. ৪৫
৭. তদেব, পৃ. ৪৫
৮. তদেব, পৃ. ৪৬
৯. তদেব, পৃ. ৫১
১০. তদেব, পৃ. ৫৮
১১. ভট্টাচার্য, শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৫৫, পৃ. ১৯০
১২. তদেব, পৃ. ৩৪
১৩. তদেব, পৃ. ৪৭
১৪. তদেব, পৃ. ১১২
১৫. তদেব, পৃ. ১১৬
১৬. তদেব, পৃ. ১১৭
১৭. তদেব, পৃ. ১২০
১৮. তদেব, পৃ. ১২১
১৯. তদেব, পৃ. ১২৫

Bibliography:

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অমাবস্যার গান, জয়শ্রী প্রকাশনী, ৩/১ বিদ্যাসাগর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, জয়শ্রী সংস্করণ, আগস্ট, ২০২৩

বিপ্লব মাঝি, 'উপন্যাসের ভাষা', অঞ্জলি পাবলিশার্স, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বের, ২০০৭

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'গোষ্ঠী জীবনের উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ২০০৯

রবীন্দ্র গুপ্ত, 'উপন্যাস জিজ্ঞাসা', গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, ২৮ আগস্ট, ১৯৯৫

ক্ষেত্র গুপ্ত, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড)। গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট, ২০০২।

সুমিতা চক্রবর্তী, 'উপন্যাসের বর্ণমালা', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, আগস্ট, ২০১৬

বেলা দাস, 'বাংলা উপন্যাসের উন্মেষ পর্ব', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, দ্বিতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, মহালয়া, ১৪২৩

অরুণকুমার বসু, 'কথাশিল্পের নানা দিক', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামা চরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ, জুন, ২০১৫

অমিতাভ দাস, 'আখ্যানতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০১৪

সত্যেন্দ্রনাথ রায়, 'বাংলা উপন্যাস ও তাঁর আধুনিকতা', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০০০

তপোধীর ভট্টাচার্য, 'উপন্যাসের সময়', এবং মুশায়েরা, ১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০২৩

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মর্ডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, নতুন পুনর্বিন্যাস সংস্করণ, ২০১৬-২০১৭

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৫৫